OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 153
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 144 - 153
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

হিন্দি ও বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত উত্তরপ্রদেশ ও বঙ্গসমাজে নারীর বৈধব্য জীবনের সংকট : তুলনামূলক অবলোকন

সুনীতা কর
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: momsunita95@gmail.com
0009-0007-7054-7959

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Premature Widowhood, Male Dominance, Social Superstitions, Religious Restrictions, Crisis of Widowhood, Psychological Conflict, Sense of self-respect, Rebellious Spirit.

Abstract
In Indian society, widowed women have long been victims of social neglect, religious taboos and mental loneliness. A burning problem in women's lives is their premature widowhood. This is like a terrible curse on women's lives. Through widowhood, a woman enters another world, separated from her normal life; where she has to give up all her hopes and aspirations, and all tastes and colors are taken away from her food and clothing. Widowhood is the biggest curse in the life of a Hindu woman. Their lives were very difficult due to social customs and traditions rather than classical customs. Widows were considered evil or inauspicious in society. In Bengali and Hindi literature, women novelists have highlighted the pain of widowhood, silent protest and crisis of self-identity in women's lives with deep sympathy. Bengali novelist Bani Basu's 'Shwet Patharer Thala' (1991) and Hindi novelist Maitreyi Pushpa's 'Betba Bahati Rahi' (1994) - these two novels in different languages highlight the pain of widowhood and their psychological complexities in the context of reforms. Women novelists in both Bengali and Hindi have not only highlighted the oppressive aspects of widowed women's lives, but have also explored women's self-identity. In their writings, widowed women are silent but not powerless, they ask questions and gradually a sense of self-awareness awakens in them. Keeping the two novels in question in front of them, a comparative assessment of the crisis of widowhood in women's lives in the writings of two different languages, different novelists, and different spatial backgrounds, rural and urban, can be made.

Discussion

এক

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 153
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হে বিধাতা?"[১]

ভারতীয় সমাজে নারীর স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার প্রশ্ন-স্বরূপ এই পঙক্তিটি এক গভীরভাব আমাদের সামনে তুলে ধরে। হিন্দু পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর পরিচয় ও ভূমিকা নির্ধারিত হত মূলত বিবাহের মাধ্যমে। ভারতীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর জীবনকে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সামাজিক বিধি-নিষেধের মধ্যে আবদ্ধ করা হত। তাই বিধবা নারীরা দীর্ঘদিন ধরেই সামাজিক অবহেলা, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও মানসিক নিঃসঙ্গতার শিকার হয়ে চলেছিল। ফলত এই সমস্যা একজন নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা, সামাজিক মর্যাদা এবং মানসিক অবস্থার ওপর গভীর প্রভাব ফেলত। সমাজে বিধবা নারীদের অশুভ বা অমঙ্গলজনক বলে মনে করা হত। শাস্ত্রীয় রীতির চেয়েও সামাজিক রীতি-নীতি বা দেশাচারের কারণে তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। রঙিন পোশাক পরা, অলংকার ব্যবহার করা, উৎসব-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর চুল ছেঁটে দেওয়া হত বিধবা নারীদের। বিভিন্ন ধরণের ব্রত, উপবাস করতে হত, নিরামিষ ও স্বল্প আহার বরাদ্দ ছিল তাদের জন্য। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার হুগলীর এক বাড়িতে নিমন্ত্রণে যান। সেই ভোজন-বাড়িটিতে সারাদিন অনেক রকমের রান্না-বান্না হচ্ছিল। সাত-আট বছরের এক বিধবা বালিকা সারাদিন ধরে ঘুরে ঘুরে সেইসব রান্না দেখছিল এবং ভাবছিল কখন সে খাবে। কিন্তু যখন খাওয়া-দাওয়া শুরু হবে ঠিক সেই সময় তাকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রাখা হয় কারণ সেদিন ছিল তার নিরম্বু উপবাস। এই ঘটনা দেখে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন এবং না খেয়ে সেই বাড়িটি থেকে বেরিয়ে যান।

অনেকক্ষেত্রে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হত বিধবাদের। তাই বিধবা নারীর ক্ষেত্রেও 'নারীর আপন ভাগ্য জয় করার' প্রশ্নটি সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। কেন এক বিধবা নারীর জীবন সমাজের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে? কেন সে নিজের ভাগ্য জয় করার অধিকার থেকে নিজে বঞ্চিত থাকবে? কেন তারা অন্য নারীদের মতো স্বচ্ছলভাবে জীবন কাটাতে পারবে না? এই প্রশ্নের উত্তর আজও আমরা খুঁজে চলেছি।

"যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।"[২]

শ্লোকটির মর্মার্থ— যেখানে নারী সম্মানিত ও সমাদৃত, সেখানে দেবতারা তুষ্ট হন। যেখানে স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে থাকেন বা অসম্মানিত হন, সে দেশের ও জাতির উন্নতি কখনো সম্ভব নয়। সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডই সেখানে নিষ্ফল।

নারীকে অবহেলা করে কোন সভ্যতার ভিত্তি দৃঢ় হতে পারে না, তা ভিতর থেকে ক্রমশ ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। কারণ নারী শুধুমাত্র সংসারের অঙ্গ নয়, সমাজের মূল চালিকা শক্তি, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাকে যথাযথ শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং মর্যাদা দেওয়া না হলে সমাজের অগ্রগতি হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষত বিধবা নারীর ক্ষেত্রে এই সত্য আরো গভীরভাবে উপলব্ধ, যে সমাজে নারীর বৈধব্যকে এখনো অভিশাপ মনে করা হয়, যেখানে নারীর ব্যক্তিসত্তা তার স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়, সেখানে মানবিকতা প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখে দাঁড়ায়। বিধবা নারী শুধু শোকের ভার বহন করে তাই নয়; তাকে বহন করতে হয় একাকীত্ব, সামাজিক নিষ্ঠুরতা, কঠোর বিধি-নিষেধের ভারও। তার হাসি-আনন্দ, তার সমস্ত স্বপ্ন, খাওয়া-পরা সবকিছুর উপর আরোপিত হয় সমাজের কড়া নিষেধাজ্ঞা। তার জীবন যেন তার নিজের নয়, সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার হাতে বন্দি। যতদিন এই বিধি-নিষেধের বেড়াজাল থাকবে ততদিন সমাজের পূর্ণবিকাশ সম্ভব নয়। উনিশ শতকে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ সংস্কারকদের হাত ধরে বিধবা নারীর অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। বিধবা-বিবাহের প্রচলন হয়, নারীশিক্ষার প্রসার ঘটে। এর ফলে বিধবা নারীরা ধীরে ধীরে সমাজের মূল ধারায় ফিরতে শুরু করে। বিধবা নারীও একজন স্বতন্ত্র মানুষ; তারও নিজস্ব স্বাধীনতা আছে, অধিকার আছে, মর্যাদা আছে; সেকথা অবশ্যই সমাজের স্মরণে রাখা কর্তব্য — আমাদের আলোচ্য দুই উপন্যাসে যেন এই বক্তব্যই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

দুই

আধুনিক সমাজে বিধবা নারীর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন শিক্ষিত, স্বাবলম্বী এবং কর্মজগতে প্রতিষ্ঠিত। তাসত্ত্বেও এখনও অনেক গ্রামীণ ও রক্ষণশীল পরিবারে বিধবাদের মানসিক যন্ত্রণা, অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 153
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হতে হয়। বাংলা ও হিন্দি কথাসাহিত্যে নারী ঔপন্যাসিকেরা নারী জীবনের বৈধব্য যন্ত্রণা, নীরব প্রতিবাদ ও আত্মপরিচয়ের সংকটকে গভীর সহমর্মিতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বাংলা ও হিন্দি এই দুই ভাষার নারী ঔপন্যাসিকেরা বিধবা নারীর জীবনের নিপীড়নের দিক শুধু তুলে ধরা নয়, নারীর আত্মপরিচয়েরও সন্ধান করেছেন। তাঁদের লেখায় বিধবারা নীরব হলেও নিষ্প্রভ নয়, তারা প্রশ্ন করে এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা বোধ জেগে ওঠে। বাঙালি ঔপন্যাসিক বাণী বসুর 'শ্বেত পাথরের থালা' (১৯৯১) এবং হিন্দি ঔপন্যাসিক মৈত্রেয়ী পুষ্পার 'বেতবা বহতী রহী' (১৯৯৪) — এই দুই ভিন্ন ভাষার উপন্যাসে সংস্কারের মোড়কে নারীজীবনের বৈধব্য যন্ত্রণাকে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাস দুটিকে সামনে রেখে তুলনামূলক বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে বিধবা নারীর সামাজিক অবস্থান, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও সম্ভাব্য মুক্তির পথ অন্বেষণ করা যেতে পারে। ভারতীয় সমাজে গ্রাম ও শহর এই দুই পরিসর কেবল ভৌগোলিক নয়, মানসিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর পার্থক্যও নির্দেশ করে। বিধবা নারীর জীবন এই দুই ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন সামাজিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়। বাংলা ও হিন্দি নারী ঔপন্যাসিকরা তাঁদের রচনায় এই পার্থক্যকে গভীরভাবে চিহ্নিত করেছেন।

বিশশতকের শেষার্ধে এক সফল ও জনপ্রিয় মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন বাণী বসু। বিশ শতকের শেষ দশকে এসে তাঁর উপন্যাসগুলি একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে যা পাঠক মহলে বিপুলভাবে সাড়া জাগায়। তাঁর লেখনীতে নারীর বিভিন্ন অবয়ব ধরা পড়েছে। পুরুষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে নারীকণ্ঠের তীব্র প্রতিরোধ ধ্বনিত হয়েছে। উপন্যাসগুলিতে বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর একাধিক অবস্থানকে তিনি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। সেখানে নারী আগে একজন স্বতন্ত্র মানুষ, তারপরে সে একজন মেয়ে। তারা পুরুষশাসিত সমাজের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। আমাদের আলোচ্য 'শ্বেত পাথরের থালা' (১৯৯১) উপন্যাসটিতে সমাজে বিধবা নারীর অবস্থানকে তুলে ধরেছেন তিনি। লেখিকা নারীদের নিজের অধিকারের জন্য সোচ্চার হতে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং পুরুষতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করার বার্তা দিয়েছেন।

অন্যদিকে হিন্দি ঔপন্যাসিক মৈত্রেয়ী পুষ্পা বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের অন্যতম প্রশংসিত লেখিকা। শহুরে সভ্যতা থেকে দূরে বসবাসকারী গ্রামীণ নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানকে তুলে ধরে, তাদের অন্তরের গভীরতম অনুভূতিগুলিকে অন্বেষণ করেছেন তিনি। তার পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন সমস্যা, বঞ্চনা এবং সংগ্রামের চিত্রও তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীতে। আমাদের আলোচ্য 'বেতবা বহতী রহী' (১৯৯৪) উপন্যাসে তিনি নারীর বৈধব্য জীবনের সংঘর্ষকে তুলে ধরেছেন। এই ভিন্ন দুই ভাষায়, ভিন্ন ঔপন্যাসিকের লেখায়, গ্রামীণ ও শহুরে ভিন্ন স্থানিক পটভূমিতে নারীর বৈধব্য জীবনের যে সংকট তার একটা তুলনামূলক মূল্যায়ন করা যায়।

তিন

অকাল বৈধব্যে নারী স্বাভাবিক জীবন-যাপন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেন এক অন্য জগতে প্রবেশ করে; যেখানে তাকে ত্যাগ করতে হয় সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার খাওয়া-পরা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় সব স্বাদ-রঙ। হিন্দু নারীর জীবনে বৈধব্যই যেন সবচেয়ে বড় অভিসম্পাত। এই জন্যই কি গুরুজনেরা সধবা মেয়েদের 'জন্ম-এয়োস্ত্রী হও' বলে আশীর্বাদ করেন? যাতে তাকে এই যন্ত্রণাময় অভিসম্পাতের মুখোমুখি হতে না হয়? আলোচ্য উপন্যাসদুটির কেন্দ্রীয় চরিত্র বন্দনা ও উর্বশীও অকাল বৈধব্যের অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে সমাজে টিকে থাকার লড়াইয়ে সামিল হয়েছে।

'শ্বেত পাথরের থালা' উপন্যাসে এক নারীর অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণাময় জীবনের সংকট ও তা থেকে উত্তরণের কাহিনী ফুটে উঠেছে। 'শ্বেত পাথরের থালা' নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। 'শ্বেত' বিধবা নারীর উপর আরোপিত শুচিতা, পবিত্রতা ও সংযমের প্রতীক, 'পাথর' সমাজের কঠোর ও অনুভূতিহীন মনোভাবকে প্রকাশ করছে এবং 'থালা' নারীর গৃহকেন্দ্রিক ও সীমাবদ্ধ জীবনের প্রতীক। উপন্যাসের নামটি বিধবা নারীর নীরব, আবদ্ধ ও কঠোর জীবনের প্রতিচ্ছবির স্বরূপ। নামকরণেও লেখিকা একটি ভাবব্যঞ্জনা পাঠকের কাছে ধাঁধার মতো করে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বন্দনা (বয়স ২৭ বছর), ছ-বছর আগে অভিমন্যু ভট্টাচার্যকে বিয়ে করে ৪৫ নম্বর শ্যামবাজার স্ট্রিটের দোতলা বাড়িতে এসে সংসার গড়ে তোলে। কিন্তু সুখ তার ভাগ্যে বেশিদিন স্থায়ী হল না। যোগীন্দর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 153
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অ্যাণ্ড যোগীন্দরের চীফ ডিজাইনার, ৪০ বছর বয়সী অভিমন্যু হঠাৎ করেই একদিন হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে বন্দনা ও তার পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলে অভিরূপ। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে তার জীবনে ঘনিয়ে আসে অকাল বৈধব্যের কালো ছায়া।

বর্তমানে নারী-পুরুষ সকলেই সমান বলে দাবি করা হলেও কুসংস্কার যে এখনও সমাজ থেকে দূরীভূত হয়নি তা বোঝা যায় বন্দনার জীবন কাহিনি থেকে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে বৈধব্যের সমস্ত নিয়ম পালন করতে হয় —

> "কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
> ন তু গৃহীয়াৎ পাত্যৌ প্রেতে পরস্য তু।।
>
> অর্থাৎ পতির মৃত্যু হইলে পবিত্র যে পুষ্পমূল ফল তাহার ভোজনের দ্বারা শরীরকে কৃশ করিবেন এবং অন্য পুরুষের নামও করিবেন না।"[৩]

কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুতে তো স্বামীকে কোনো নিয়মই পালন করতে হয় না। তাহলে এই নিয়ম শুধুমাত্র নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে কেন? এই প্রশ্নের মাধ্যমেই সমাজের দিকে সরাসরি আঙুল তোলেন ঔপন্যাসিক। অভিমন্যু চলে যাওয়ার যে নিদারুণ শোক সে কি শুধুমাত্র বন্দনার একার? শ্বশুর-শাশুড়িরও তো পুত্রশোক আছে তাহলে নিরামিষ আহার কেবল তার জন্যই কেন বরাদ্দ থাকবে? আজ যদি অভিমন্যুর জায়গায় সে চলে যেত, তাহলে অভিমন্যুকেও কি সমস্ত নিয়ম পালন করতে হত? তাই বন্দনার মনে প্রশ্ন জাগে—

> "তার স্বামী-বিয়োগের শোক যেমন প্রচণ্ড, শাশুড়ির পুত্রশোকও কি তেমনি প্রচণ্ড নয় তাহলে? স্বামীহারা স্ত্রীর রসনা যদি খাদ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাবে বলে লোকে প্রত্যাশা করে, পুত্রহীনা মায়ের ক্ষেত্রেও তো তাই-ই হবার কথা। আর শুধু মা-ই বা কেন? বাবা? বাবা কি ছেলেকে কম ভালোবাসেন? ...বিপত্নীকের দুঃখই বা কম কিসে? আজ যদি অভিমন্যু থাকত, বন্দনা চলে যেত, অভিমন্যুর কি এরকম বুকের শিরছেঁড়া যন্ত্রণা হত না? তার জন্যে কি নিরামিষ হেঁশেল হোত? এমনি আলাদা আয়োজন? আলাদা প্রয়োজন?"[৪]

ঔপন্যাসিক আসলে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবি তুলেছেন। যদি বন্দনা মারা যেত তাহলে তার স্বামীকেও কি এভাবেই বৈধব্যের নিয়ম পালন করতে হত? তার এই প্রশ্ন কেবল স্বামী বা শ্বশুরের প্রতি নয়, সমগ্র পুরুষ সমাজের প্রতি। 'বেতবা বহতী রহী' উপন্যাসটি উর্বশীর মতো এক দরিদ্র, সাধারণ মেয়ের কথা বলে। উর্বশীর পিতা কঠোর পরিশ্রম করে কোনরকমে সংসার চালায়। ভাই অজিত মায়ের গয়না বিক্রি করে টাকা নেয় কিন্তু বোনের বিয়ে কোনো বড় ঘরে দিয়ে তার ওপর পয়সা খরচা করতে চায় না। এজন্য চার বাচ্চার বাবার সঙ্গে উর্বশীর বিয়ে দিতে চায়। মীরার নানা (দাদু) স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে সিরসা গ্রামের শত্রুজিতের ছোট ভাই সর্বদমনের সঙ্গে উর্বশীর বিয়ে ঠিক করে, যে পেশায় উকিল ছিল। উর্বশীর বিয়ে ঠিক হলে বিয়ের যাবতীয় খরচের জন্য তার বাবার একমাত্র ভরসা ছিল পুত্র অজিত। কিন্তু উর্বশীর বিয়েতে এক পয়সাও খরচা করতে পারবে না বলে সে জানিয়ে দেয়। ছেলের কথা শুনে যেন বাবার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছিল। বিয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার একার কাঁধে? তিনি কিভাবে সব কিছু সামলাবেন? তার আর্থিক সামর্থ্য তো ছেলের উপর নির্ভরশীল। শূন্য হৃদয় নিয়ে তিনি পরাজিত হলেন - দারিদ্র্যের কাছে নয়, জীবনের কাছেও নয়; তিনি হেরে গেলেন নিজের ছেলের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ প্রতারণার কাছে। বাড়ির গয়না বিক্রি করে, সুদে টাকা ধার নিয়ে অজিতকে পড়াশোনা করিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ছেলে স্বনির্ভর হয়ে পরিবারের সকলের দায়িত্ব নেবে, যেমনটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সচরাচর হয়ে থাকে। কিন্তু উর্বশীর জন্য তো সারাজীবন কিছুই করে উঠতে পারেননি। উর্বশীর বিয়ের জন্য মীরার নানা ও উর্বশীর বাবা বিডিও সাহেবের কাছে লোন নিতে যায়। লোন নেওয়ার সময়সীমা শেষ হয়ে গেলেও বিডিও সাহেব এই দুই বৃদ্ধকে নিরাশ করেননি। তাঁরা লোন পেয়ে উর্বশীর বিয়ে দেন। সর্বদমনের কাছে উর্বশী অনেক ভালোবাসা পায়। তাদের এক পুত্র সন্তান জন্মায়, দেবেশ। কিন্তু বন্দনার মতোই উর্বশীর ভাগ্যও তার সাথে প্রতারণা করলো। এক পথ দুর্ঘটনায় উর্বশীর স্বামী মারা যায়। তার সুখী গৃহকোণ কোনো এক অপ্রত্যাশিত ঝড়ে ভেঙে গেল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 153
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চার

উর্বশীর ভাই অজিত ও পিতৃসম বরজোর সিং দুজনেই পাশব প্রবৃত্তির পুরুষ। স্বামী সর্বদমনের মৃত্যুর পর এই দুই পুরুষের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিলে তিলে শেষ হয়ে যায় সে। বরজোর সিং, যে কিনা উর্বশীর বাল্য সখী মীরার বাবা; একজন অর্থপিশাচ এবং কামান্ধ পুরুষ। দশবিঘে জমির পরিবর্তে অজিত বরজোর সিং এর কাছে দিদিকে বিক্রি করে দেয়। একরকম আদিম যুগীয় মানসিকতা গ্রাস করেছিল অজিতকে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই নারীকে পুরুষের ভোগের সামগ্রী মনে করা হয়। দরিদ্র পরিবারে আজও অর্থের লোভে মেয়েদের বিক্রি করা হয়—

> "বিপন্ন মানসিকতা কে দুর্মুহ সমাজ মেঁ আজ ভী নারী মাত্র বস্তু! মাত্র সম্পত্তি! বিনিময় কী চীজ!"[৫]

উপন্যাসে উর্বশীর মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র নারীর দুঃখ-যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক।

বন্দনা ছোট থেকেই অভাব কি জিনিস তা বোঝেনি। তার ভাই-বোন নেই, মা ছোটবেলায় মারা যায়, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারে বাবা-কাকার অত্যন্ত আদর-যত্নে মানুষ হয়েছে সে। অন্যদিকে উর্বশীর জন্ম অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে, মা-বাবা এবং ভাই অজিতকে নিয়েই তাদের ছোট সংসার। উর্বশী স্বর্গের অপ্সরার মতোই সুন্দরী। দরিদ্রের শূন্য ঘরে চাঁদের আলোর মতো রূপ নিয়ে এসেছে সে। লক্ষী কৃপণ হলেও বিধাতা তাকে সৌন্দর্য অঢেল দিয়েছেন। আর এই সৌন্দর্যই তার জীবনে অভিশাপ হয়ে এসেছে। 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী'[৬] — নিজের মাংসই যেমন হরিণের শত্রু, ঠিক তেমনই উর্বশীর নিজের সৌন্দর্যই তার জীবনে সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্দনা ও উর্বশী দুজনেই প্রাণোচ্ছল, আমুদে ও শান্ত স্বভাবের মেয়ে। অথচ নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাদের দুজনের জীবনেই নেমে আসে চরম বিপর্যয়।

এই পর্যায়ে এসে বন্দনা ও উর্বশী যেন একই পথের পথিক। তাদের ভালোবাসার মানুষই আজ তাদের সঙ্গে নেই। কিন্তু যারা এতদিন সুন্দরভাবে মেলামেশা করেছিল তারাও কেমন যেন চোখের সামনে বদলে যাচ্ছে। বন্দনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা শিক্ষিত হলেও পুরনো সংস্কারের বেড়াজালে আবৃত। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা বন্দনার জন্য বিধান দেন শ্বেত বস্ত্র পরিধানের, শ্বেত পাথরের থালায় নিরামিষান্ন গ্রহণের। দিনের পর দিন আলু কাঁচকলার হবিষ্যান্ন ও আতপ চালের ভাত খেতে খেতে বন্দনার মন একটুকরো মাছের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। উর্বশীর পরিধানের ক্ষেত্রেও কিছুটা একই ছবি দেখতে পাই আমরা—

> "উর্বশী গিরতী কাহারতী উসকে সমক্ষ লাকর খড়ী কর দী — সফেদ সুতী, ধোতী-ব্লাউজ, নঙ্গে-উজাড় হাথ, বিছিয়া সুতী পায়োঁ কী নাঙ্গই উঁগলিয়াঁ, উসকে বৈধব্য পর বিসুরতী হুই।"[৭]

বন্দনার জীবনের অন্ধকার অধ্যায় তার বৈধব্য অবস্থা। এই বৈধব্য তাকে শত দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করলেও একটি ক্ষেত্রে তাকে স্বাবলম্বী করে তুলেছে। সে মানুষ চিনতে শিখেছে। সংসারে চেনা মানুষগুলোর মুখের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মুখোশকে বন্দনার শোকগ্রস্ত হৃদয় চিনতে ভুল করেছিল। বাবা-কাকার অতি আদরের যে মেয়ে একদিন মাছ ছাড়া ভাত খেতেই পারতো না, আজ তার জন্য শুধুমাত্র আতপ চালের ভাত ও আনাজ সেদ্ধ বরাদ্দ করা হয়েছে। যে শাশুড়ি-শ্বশুরমশাই তাকে অত স্নেহ করতেন, আজ তারাই যেন সবচাইতে বেশি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছেন। বন্দনার শাশুড়ির কথায়—

> "সেদিন কথায় কথায় বউমার হাতখানা সোজা করে ধরেছিলুম, স্পষ্ট বৈধব্য রেখা। ওসব মেয়েছেলের কপালে হয় গো, কপালে হয়।"[৮]

উর্বশীর ক্ষেত্রে চিত্রটা কিছুটা অন্যরকম, তার যন্ত্রণাটা একটু অন্য জায়গায়। সর্বদমনের মৃত্যুর পর উর্বশী একাকী, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেও পুত্র দেবেশের প্রতি উপচে পড়া ভালোবাসা ও অবাধ স্নেহ উর্বশীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের ক্ষতকে সারিয়ে তোলে। বিধবা হওয়ার পর উর্বশী সকলের কাছে করুণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় অজিত উর্বশীর কাছে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করে। তার ভাইয়ের এহেন আচরণে উর্বশী নিজেও অবাক হয়ে যায়। স্বামী জীবিত থাকতে যে ভাই কোনদিনও তার খোঁজ খবর নেয়নি, উৎসব-অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায়নি; আজ হঠাৎ বিধবা হওয়ার পর তার স্নেহের এমন আকস্মিক ঢেউ এলো কোথা থেকে? উর্বশীর মনে সন্দেহ বাসা বাঁধে। স্বামীর মৃত্যুর পর অজিত তার সম্পত্তির লোভে উর্বশীকে বাড়িতে নিয়ে আসতে চায়। নিজের স্বার্থের জন্য বোনকে ব্যবহার করতে চায়। নিঃসঙ্গ, বিধবা বোনের প্রতি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 153
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভাইয়ের এরূপ আচরণ কি আশা করা যায়? গ্রামীণ বিধবা নারীর জীবন যেন অনেক বেশি কঠোরতায় আবদ্ধ। সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ এবং পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সেখানে আরোও প্রবল।

বন্দনার যখন দশ-এগারো বছর বয়স তখন তার মা মারা যান। স্ত্রীলোকহীন সংসারে বাবা-কাকার তত্ত্বাবধানে থেকেই পড়াশোনা, গান-বাজনা শিখেছে সে। মেয়েলি আচার-বিচার, বৈধব্যের নিয়ম-কানুন এসমস্ত কোনোকিছুই তার জানা ছিল না। সংসারের শূন্য সিঁথি, থান পরা বিধবাদের সাধারণভাবেই দেখেছে সে। আজ হঠাৎ নিজে সেই সাদা থান পরাদের দলে ভর্তি হয়ে তার যেন বোধোদয় হল। একসময় যে ফুলের গন্ধ, সানাইয়ের আওয়াজ, অলংকারের প্রাচুর্যে সজ্জিত হয়ে খুশি মনে সধবা জীবনে প্রবেশ করেছিল, বৈধব্যের কারণে আজ সেই জিনিসগুলিই তার কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। ধনী-দরিদ্রে যেমন বিস্তর পার্থক্য, নীল রক্ত আর লাল রক্তে যেমন ঠিক তেমনই সধবা আর বিধবার জীবনের মাঝখানেও যেন এক দুস্তর ব্যবধান।

পাঁচ

'শ্বেত পাথরের থালা' উপন্যাসটি শহুরে প্রেক্ষাপটে লেখা। কিন্তু এই শহুরে সমাজের মানসিকতা পুরোপুরি গোঁড়ামি মুক্ত নয়। শিক্ষিত সমাজের ভদ্রতার আড়ালে একধরণের সূক্ষ্ম বঞ্চনা কাজ করে। বন্দনার রক্ষণশীল শ্বশুরবাড়িতে পুরুষদের জন্য অবশ্য কোন নিয়ম বাধা নেই, সবটাই মেয়ে মহলের জন্য—

> "বাড়ির ছেলেরা, কর্তারা বাসি-টাসি মানার ধার ধারে না। ওসব পবিত্রতা খালি মেয়েমহলের জন্যে। শাশুড়ি বলেন মেয়েছেলের চরিত্তিরেই বাড়ির চরিত্তির। ব্যাটাছেলের দস্তখত আর মেয়েছেলের সহবত। ব্যাটাছেলের এক এক আঁচড় সইয়ে এক এক থলি টাকা উঠে আসবে। আর মেয়েছেলের শীল-শাল, হায়া-লজ্জা, আচার-বিচারেই বাড়ির মান-ইজ্জত।"[৯]

এহেন রক্ষণশীল শ্বশুরবাড়িতে বৈধব্যের যন্ত্রণাময় জীবন কাটানোর মধ্য দিয়ে বন্দনা যখন তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই তার জীবনে আশার আলো হয়ে আসে তার কাকা, সোমনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে সেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে বন্দনা ও তার একরত্তি সন্তান। কাকা ছিলেন কর্মঠ, স্নেহপ্রবণ ও উদার ব্যক্তিত্বের মানুষ। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্বশুরবাড়ি থেকে বন্দনাকে বের করে এনে তাকে স্বামীর মৃত্যুশোক ও বৈধব্যের কঠোর নিয়ম পালন থেকে দূরে সরিয়ে সুস্থ জীবন প্রদান করেন।

উর্বশীর জীবনেও এরকম একজন মানুষ হল তার দাউ (সর্বদমনের দাদা)। সর্বদমনের মা মারা যাবার পর থেকে সে তার দাউ অর্থাৎ দাদা এবং বৌদির কাছেই মানুষ। এই দাউ-ই সর্বদমনের মৃত্যুর পর উর্বশীকে নিজের সন্তানের মত করে যত্নে রাখে, তার পুত্র দেবেশকে অভিভাবকের ন্যায় আগলে রাখে। তাই উর্বশী অজিতের কথামতো কাজ করতে রাজি না হলে, অজিত উর্বশী ও তার পিতৃতুল্য ভাসুরের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের কথা রটায়। এই চরম অপমান সহ্য করতে না পেরে উর্বশী বাধ্য হয় অজিতের কথামতো কাজ করতে। সবাইকে সুখী করতে আত্মবলিদান দেয় সে। শ্বশুরবাড়ির নিরাপদ ঠিকানা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় সে। বন্দনাও উর্বশীর মতো শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু সেই বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্য ছিল নতুন করে বাঁচা, নতুন করে জীবনকে উপভোগ করা। কিন্তু উর্বশী? সে কোন্ অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াচ্ছে? দশ বিঘা জমির পরিবর্তে বরজোর সিং এর কাছে উর্বশীকে বিক্রি করে দেয় অজিত। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে যেদিন উর্বশী বরজোর সিংকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়, সেদিনই তার অন্তরাত্মার মৃত্যু ঘটে। জীবিত লাশ হয়ে সে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। উর্বশীকে বিয়ের পর বরজোর সিং তার পাশব প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে অতৃপ্ত কামনার তৃপ্তি ঘটায়। নিয়তি যেন উর্বশীকে কোন চরম অপরাধের শাস্তি দিচ্ছে, অভিশপ্ত জীবনের অন্ধকার প্রবেশদ্বারটি যেন তার জন্য খুলে দিয়েছে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর নিজস্ব জীবনের উপর কোনো অধিকার নেই, তার নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা নেই—

> "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 153
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

অর্থাৎ স্ত্রীলোককে পিতা কুমারী জীবনে, স্বামী যৌবনে ও পুত্র বার্ধক্যে রক্ষা করে; স্ত্রীলোক কখনও স্বাধীনতার যোগ্য নয়।”[১০]

—এই ভাবনারই যেন প্রতিফলন ঘটেছে বন্দনা ও উর্বশীর জীবনে। নারীর সমগ্র জীবন যেন তিনটি পৃথকভাবে ভাগ হয়ে যায়। বিবাহের পূর্বে পিতার অধীনে, বিবাহের পর স্বামীর অধীনে এবং স্বামীর অবর্তমানে পুত্রের অধীনে; নারীর অবস্থানের এই চিত্রটিই প্রতিফলিত হয়েছে বন্দনার জীবনের মধ্য দিয়ে। স্বামীকে হারানোর পর বন্দনা তার সমগ্র জীবন পুত্রের জন্য আত্মোৎসর্গ করে। সাদা থান পরিহিত বন্দনার মধ্যে চিরপরিচিত মাতৃরূপকে খুঁজে পায় না পাঁচ বছরের শিশু সন্তান অভিরূপ। মাতৃস্পর্শ ভুলে গেছে সে, মায়ের চুড়ির আওয়াজ, মাথার তেলের গন্ধ সবকিছু মিলিয়ে বলা যেতে পারে মাতৃগন্ধটাই ভুলে গেছে সে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে পুত্রের কল্যাণার্থে মাতৃত্বের পরীক্ষা দিতে হয় বন্দনাকে। একটাই ভরসা তার সন্তান তার কাছেই ছিল, সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে সব কষ্ট হাসি মুখে সহ্য করেছে সে। কিন্তু উর্বশী? তার একমাত্র ভরসার আশ্রয় তো তার কাছে ছিল না। একদিকে সতীত্বের যন্ত্রণা অন্যদিকে মাতৃত্বের যন্ত্রণা। সন্তানকে কাছে না পাবার যন্ত্রণায় প্রতিটা মুহূর্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তার হৃদয়। একদিকে স্বামীহারা, অন্যদিকে পুত্র থেকেও তাকে কাছে না পাওয়া একাকী, নিঃসঙ্গ এক নারী, যাকে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বার্থান্বেষী মনোভাবের শিকার হতে হয়েছে। বন্দনার লড়াইটা তার নিজের সঙ্গে হলেও, উর্বশীর লড়াইটা তার পরিবার ও সমাজের সঙ্গে।

বন্দনার কাকা তাকে স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, স্কুলের চাকরি গ্রহণ সবকিছুর মধ্য দিয়ে আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু বিশশতকের পঞ্চাশের দশকে বন্দনার মতো বাঙালি রক্ষণশীল পরিবারের বিধবা নারীর এই ধরনের জীবনযাপন তীব্রভাবে নিন্দিত হয় সমাজের চোখে। স্কুলের চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয় সে। বন্দনার মনের মধ্যে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করে। স্বামীর বন্ধুর অফিসে চাকরি নেওয়া, সুদীপ্তর প্রেমকে স্বীকৃতি প্রদান সর্বক্ষেত্রেই মানসিক দোলাচলতার সম্মুখীন হতে হয় তাকে। বন্দনা ও তার ছেলে অভিরূপ যখন সুদীপ্তর সঙ্গে ফুলেশ্বরে বেড়াতে গিয়ে আপনমনে গান গেয়ে ওঠে জীবনের গভীর অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করার জন্য তখন সুদীপ্ত অভিরূপকে বলে—

> “গান গায় মানুষ ভেতরের তাগিদে, নিজেকে যখন আর ধরে রাখতে পারে না, তখন। সেই গান জোর করে বন্ধ করে দিলে মানুষের বুক ফেটে যায়।”[১১]

সন্তানের কাছে মাতৃসত্তাকে বড় করতে চেয়ে নিজের নারীসত্তাকে পদে পদে বিসর্জন দিয়েছে বন্দনা। অথচ যার জন্য মায়ের এত আত্মত্যাগ, এত আবেগ-দুশ্চিন্তা, সেই সন্তানই বড় হয়ে বেপরোয়া, একরোখা হয়ে মায়ের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে তোলে। স্বামীর অবর্তমানে মধ্য বয়সে এসে পুত্রের কাছে তাকে বারবার লাঞ্ছিত, অপমানিত হতে হয়। ফলত একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা বন্দনার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। তার জীবনের একমাত্র পিছুটান তার সন্তান। এই সন্তানের জন্যই সমাজ, পরিবার ও কর্মক্ষেত্র— জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র সত্তায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয় সে। বন্দনা তার একাকীত্বের যন্ত্রণা দূর করার জন্য সুদীপ্তকে বিয়ে করার কথা ভাবে। রক্ত-মাংসে গড়া বন্দনার যৌবন তাড়না জন্মেছিল, তা কিন্তু নয়। সে সুদীপ্তর কাছে ভরসার ছাতা দাবী করেছিল, যেই ছাতার ছায়ায় তাঁর পরবর্তী জীবনের সর্বময় জ্বালা দূর হবে। কিন্তু সন্তানের আপত্তি থাকায় সেই মুহূর্তেই সে সমস্ত স্বপ্ন দেখা বন্ধ করেছে। এতো পুত্রস্নেহে মায়ের সর্বস্ব দান। কিন্তু পরবর্তীতে আবার সেই সন্তানই নিজের ব্যক্তিস্বার্থের কারণে সুদীপ্তকে বিয়ে করার জন্য মাকে জোর করে। এক মা শুধুমাত্র তার সন্তানের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়ে সেই সময় বিয়ে ভাঙল। কিন্তু সেই সন্তানই পরে নিজের সুবিধার্থে মাকে পুনরায় বিয়ে করতে বলে। মা কি তাহলে তার কাছে ব্যবসায়িক বস্তুমাত্র? বন্দনার মমত্বের কোন মূল্যই নেই? সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার পরিচয় কি তবে শুধু ভাতের থালা আর পরনের কাপড়ে? তার শেষ সম্বল পুত্রের কাছ থেকেও যখন আঘাত আসে তখন জীবনে নতুন পথে বাঁচার প্রয়োজন বোধ করে সে।

একেবারে উপন্যাসের শেষে বন্দনা চরিত্রের উত্তরণ ঘটেছে। ঔপন্যাসিক ষাট বছর বয়সী প্রৌঢ় বন্দনাকে ইউরোপ পাঠিয়েছেন। জীবনের এই পর্যায়ে এসে সে মৃত স্বামীর বিধবা বউ নয়, সন্তানের মা নয়, কারো প্রেমিকা নয়— এক স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে পুরুষের সাহায্য ছাড়াই নিজেকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে সে। ‘আত্মদীপ’ নামক জড়বুদ্ধি সম্পন্ন অনাথ শিশুদের দায়িত্ব একাই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে, তাদের মাঝে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেয়েছে সে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 153
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ছয়

'শ্বেত পাথরের থালা' উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক। যেসময় বাঙালি মহিলারা সবেমাত্র গৃহজীবনের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করেছে, সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এক বিধবা নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। বাঙালি বৈধব্যের চিরাচরিত আচার সর্বস্বতার বিধি-নিষেধের বেড়াজাল থেকে বের করে ঔপন্যাসিক বন্দনাকে দিয়েছেন স্বাধীনভাবে জীবানাচরণের অধিকার। সনাতনী নিয়ম-কানুনের বাইরে নিয়ে গিয়ে বিধবা বন্দনাকে রঙিন স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন তার কাকা। বন্দনা নিরামিষ আহারের পরিবর্তে আমিষ ভোজন ও শ্বেত বস্ত্রের পরিবর্তে রঙিন বস্ত্র পরিধান করেছে। এক নিঃসঙ্গ বিধবার ভালোবাসাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক সুদীপ্ত ও বন্দনার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, যা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গিয়ে নতুন ধ্বজা ওড়ানোর সমতুল। আর ঔপন্যাসিক বাণী বসু সেই ধ্বজা উড়িয়ে নারী জীবনের পুনঃনির্মাণ করেছেন। সুদীপ্ত ও বিধবা বন্দনার ভালোবাসা গোঁড়া সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখানো নারী-স্বাধীনতার এক বিরল দৃষ্টান্ত। এইভাবে ঔপন্যাসিক বিধবা নারীদের পাশে দাঁড়িয়ে হাত ধরে তাদের আলোর পথে নিয়ে এসেছেন।

বন্দনার মধ্যে আমরা এক প্রতিবাদী নারী চরিত্রকে দেখতে পাই। বন্দনা শান্ত স্বভাবের মেয়ে, তার 'কথাবার্তা মৃদু, দৃঢ় অথচ সপ্রতিভ' ধরণের। কিন্তু প্রয়োজনে সেও প্রতিবাদ করে ওঠে। নিরামিষান্ন খেতে না পারায় সে প্রতিবাদ জানায় এবং তারপরে যখন স্বামীর অফিস থেকে প্রাপ্য টাকা শ্বশুর নিজের অ্যাকাউন্টে রাখতে চাইলেন, তখন বন্দনা পুনরায় তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় এবং টাকাটা নিজের কাছে সঞ্চিত রাখে। কিন্তু উর্বশীকে সেভাবে আমরা প্রতিবাদ করতে দেখি না। শুধু একবারই তার প্রতিবাদী সত্তার পরিচয় পাই আমরা, আর সেটাই তার জীবনে সর্বনাশের কারণ হয়। উদয় যখন তার বিধবা বৌদিকে বিয়ে করার কথা জানায় তখন একমাত্র উর্বশীই তার পক্ষ নেয়। নিজে বিধবা হয়ে সে উপলব্ধি করেছিল বৈধব্য জীবনের যন্ত্রণা, তাই সে চায়নি আর কোনো বিধবা নারী তার মতো কষ্ট সহ্য করুক, কোনো কামুক পুরুষের লালসার শিকার হোক। তাই সে উদয়ের বিধবা বিবাহের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এবং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিয়ে দেয়। এই ঘটনা বরজোর সিং এর মতো পাশব প্রবৃত্তির পুরুষ মেনে নিতে পারেনি, তাই শাস্তিস্বরূপ উর্বশীকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়। উর্বশীর মতো এমন অনেক মেয়ে আছে যারা হয়তো প্রতিবাদ করতে পারে না বা প্রতিবাদ করলেও তারা হেরে যায়। তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী অজিত এবং বরজোর সিং এর মত পাশব প্রবৃত্তির পুরুষেরা। উর্বশীর তো কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। সে শুধু বাঁচতে চেয়েছিল, নিজের শর্তে নিজের জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সমাজ তার এই চাওয়াটাকে মান্যতা দেয়নি। কারণ, নারী যখনই স্বাধীনভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে তার জীবন কাটাতে চেয়েছে, তখনই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার বিরোধিতা করেছে—

"য্যায়সে হি লেড়কী
কুছ নয়া করনা চাহতী হ্যায়
আকেলী পড় যাতী হ্যায়
বরনা তো লোগ সাথ দেতে হি হ্যায়
এক দেবী কা এক সতী কা এক রেণ্ডী কা।"[১২]

সাত

মৈত্রেয়ী পুষ্পার শৈশব ও কৈশোর কাটে ঝাঁসির নিকটবর্তী বুন্দেলখন্ডের একটি গ্রামে। তিনি তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসগুলিতে মূলত বুন্দেলখন্ডের গ্রাম জীবনকে তুলে ধরেছেন। সমাজে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসের উপর তিনি আলোকপাত করেছেন। উপন্যাসে কিছু কিছু সংস্কারের উল্লেখ আছে, যেমন মাথার উপর কাক বসলে অশুভ মানা হয়, উর্বশী বিয়ের পরে যাবার সময় কারোর হাঁচি হলে সেটা অমঙ্গল বলে ধরে নেওয়া হয়, বিয়ের মতো শুভ অনুষ্ঠানে উর্বশীর মতো বিধবাদের যাওয়া নিষিদ্ধ ইত্যাদি। এছাড়াও বেতবা নদীকে ঘিরে আরও একটি সংস্কারের উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে। বিয়ের পর এই নদীতে চাল-হলুদ অর্পণ করে মেয়ে তার বাবা-মা-ভাইয়ের জন্য মঙ্গলকামনা করে শ্বশুরবাড়ি যায়। ভারতীয় সমাজে দীর্ঘদিন ধরেই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 153
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিভিন্ন নিয়ম-নীতি চলে আসছে। কেউ পালন না করলে তাকে সমাজ থেকে প্রতারিত করা হয়। স্বামীহীনা নারী পরিবারে, সমাজে যেন বোঝা; স্বামী থাকলেই নারীর যত্ন ও সুখ থাকে।

'শ্বেত পাথরের থালা' উপন্যাসে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে বন্দনার মতো বিধবা নারীর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সামাজিক নিপীড়নের চেয়ে মানসিক নিঃসঙ্গতা ও আত্মপরিচয়ের সংকট বেশি দেখা যায়। 'বেতবা বহতী রহী' উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে বিধবা নারীর জীবনের চিত্র অধিকতর কঠোর ও নির্মম। সেখানে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন সুযোগ নেই, পরিবর্তে রয়েছে সমাজ কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক শোষণ। বাণী বসু বন্দনার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ ঘটালেও, মৈত্রেয়ী পুষ্পা উর্বশীর মধ্যে সেই সাহসের সঞ্চার ঘটাতে পারেননি। কিন্তু বন্দনা ও উর্বশীর জীবন কাহিনির মধ্যে এত পার্থক্য কেন? বন্দনা একজন বিধবা নারী হয়েও সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত পার করে জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে কিন্তু উর্বশী তা পারল না কেন?

শিক্ষা নারীকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে এবং পরোক্ষে তেজস্বিনীও করে তোলে, তার প্রমাণ আমরা বন্দনা ও উর্বশী এই দুই চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করলেই পাই। উর্বশীর ভাসুর তাকে সন্তানের মতো স্নেহ করেছেন। স্বামী তাকে মানসিক শক্তি জুগিয়েছে, নারীর জীবনের বিভিন্ন কুসংস্কারের বাঁধন ছিঁড়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছে —

> "কভী মেঁ না রহুঁ উর্বশী তো তুম র‍্যাহেনা। দেখ রেহি হো সামনে সতী কা চৌরা—অ্যায়সি সতী মত হো জানা—ইয়ে কায়র থী। তুম কায়র নেহীঁ হো উর্বশী—তুম মেরী পত্নী হো — সর্বদমন কী অর্ধাঙ্গিনী—সাহসী, নির্ভীক। ...অ্যায়সে সন্ত্রস্ত হোকর নেহীঁ, বাহাদুর বনকর রহো। যন্ত্রণা সে লড়না সীখো, সামনা করকে জিয়ো।"[১৩]

স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়ি থেকে উর্বশী পুরোপুরি স্বাধীনতা পেয়েছে, অন্যদিকে বন্দনা কিন্তু তা পায়নি। তা সত্ত্বেও উর্বশী প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না কারণ উর্বশীর শিক্ষার জোর নেই, অর্থের জোর নেই। বন্দনার এ দুটোই ছিল। দারিদ্র্যতা, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন দিক দিয়ে উর্বশী বন্দনার থেকে পিছিয়ে। বন্দনা একজন শিক্ষিত নারী। তাই শ্বশুরবাড়ির সাহায্য না পেয়েও সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে, আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। বন্দনার ক্ষেত্রে সমাজের কড়া বাঁধন ছিল না, তার শিক্ষা ছিল, অর্থের জন্যও তাকে নিরন্তর চেষ্টা করে যেতে হয়নি কিন্তু উর্বশীর ক্ষেত্রে যেহেতু সমাজের কড়া বাঁধন ছিল, তার শিক্ষা ছিল না, তার অর্থচিন্তা ছিল; এসমস্ত কারণে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তাই উর্বশীর ক্ষেত্রে স্বামীর পরিবার থেকে পূর্ণ সহযোগিতা থাকলেও তার জীবনের উত্তরণ ঘটেনি। আসলে যদি ভেতর থেকে তেজ না আসে, তাহলে বাহ্যিক সাহায্য থাকলেও প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। উর্বশীর মধ্যে সেই তেজস্বিনী প্রতিবাদী সত্তার অভাব ছিল।

ঔপন্যাসিক বেতবা নদীর সঙ্গে উর্বশীর জীবনকে তুলনা করেছেন। নদী এগিয়ে যায় সাগরে মুক্তির জন্য। কিন্তু নদীর জলের যদি স্রোত না থাকে, তাহলে তার গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। উর্বশী-নদীর স্রোত ছিল না কারণ তার শিক্ষা ছিল না, অর্থ ছিল না। তার ফলে সে অকালেই রুদ্ধ হয়ে গেল। অন্যদিকে বন্দনা প্রকৃতই গতিময় নদী কারণ তার ভেতরে স্রোত ছিল, তার শিক্ষা ছিল, অর্থও ছিল।

নারীর জীবন যেমন সামাজিক বদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ, তেমনি তার অন্তর্লোক ক্রমাগত মুক্তির পথ খোঁজে। বেতবা নদী জীবনের ধারাবাহিকতা, পরিবর্তন এবং মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। নদী যেমন থেমে থাকে না, তেমনি নারীর জীবনও থেমে থাকে না। সমস্ত বাধা, দুঃখ, সামাজিক নিষেধাজ্ঞা পেরিয়েও সে এগিয়ে চলে। উর্বশীর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার জীবনের মুক্তি ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক —

> "বেতবা কে নির্মল জল মেঁ ধীরে-ধীরে উর্বশী কী কঞ্চন কায়া সমানে লগী। আসমান জল উঠা। জল উঠী ধরতী অউর সারে দাহ কো স্বয়ম মেঁ সমেটে, আগ কী লপটোঁ কে সাথ-সাথ ধধকতী বেতবা ক্রুদ্ধ ভাব সে বেহেতী রহী।"[১৪]

জলের যেমন রঙ নেই, তাতে যে রঙ দেওয়া হয় তাতেই তা রেঙে ওঠে। তেমনই নারীদেরও কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছার রঙে রাঙতে নেই। সমাজ, পুরুষতন্ত্র, পরিবার যেভাবে রাঙাতে চায়, তাকে সেভাবেই সাজতে হয় —

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 153
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "কিঁউকি বো অওরত হ্যায়, অওরত সদেব রেহেতী হ্যায়— সহেনে কে লিয়ে, ঝেলনে কে লিয়ে অউর জুঝনে কে লিয়ে... ।"[১৫]

উর্বশী এই রঙে সেজে উঠলেও বন্দনা শেষ জীবনে এমনটা করেনি। সে তার জীবনের আপন রঙে রেঙে প্রৌঢ়া জীবনকে সৌন্দর্যময় করে তুলেছে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সঞ্চয়িতা*, শুভম পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০০৬, পৃ. ৪৬৭
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, *মনুসংহিতা* (ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৯১
৩. ঘোষ, ডক্টর অজিতকুমার (প্রধান সম্পা.), *রামমোহন রচনাবলী*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ১৯৭৩, পৃ. ১৭০
৪. বসু, বাণী, *শ্বেত পাথরের থালা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৩২
৫. পুষ্পা, মৈত্রেয়ী, *বেতবা বহতী রহী*, কিতাবঘর প্রকাশন, নই দিল্লী, সপ্তম সংস্করণ, ২০২৬, পৃ. ৮
৬. দাশ, ড. নির্মল, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৯৭, পৃ. ১৩১
৭. পুষ্পা, মৈত্রেয়ী, *বেতবা বহতী রহী*, কিতাবঘর প্রকাশন, নই দিল্লী, সপ্তম সংস্করণ, ২০২৬, পৃ. ৬৪
৮. বসু, বাণী, *শ্বেত পাথরের থালা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫৩
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, *মনুসংহিতা* (ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ২৪৮
১১. বসু, বাণী, *শ্বেত পাথরের থালা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১৫৫
১২. পুষ্পা, *সুনো মালিক সুনো*, বাণী প্রকাশন, নই দিল্লী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬, পৃ. ১৭৬
১৩. পুষ্পা, মৈত্রেয়ী, *বেতবা বহতী রহী*, কিতাবঘর প্রকাশন, নই দিল্লী, সপ্তম সংস্করণ, ২০২৬, পৃ. ১১৬
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০
১৫. পুষ্পা, মৈত্রেয়ী, *বেতবা বহতী রহী*, কিতাবঘর প্রকাশন, নই দিল্লী, সপ্তম সংস্করণ, ২০২৬, পৃ. ৮